প্রযুক্তি দিয়ে মাছ চাষ দারিদ্র্যতা পাবে হ্রাস

গৌতম কুমার রায়

ছোট এক পরিসরে অনেক জনাধিক্ষ্যের দেশ আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। জলে সোনা। আবার জমিনে ফসল এবং ফল। আমাদের একদিকে নোনাজল অন্যদিকে আমাদের রয়েছে মিষ্টি জল। এক কথায় আমরা দুই স্বাধের জলে খুজে পাই কাঁকড়া, চিংড়ি, কুঁচে, কাছিম, আবার ইলিশ, রুই কাতলাসহ হরেক প্রজাতির মাছ।

জলে আমাদের রয়েছে জলজ সম্পদের অফুরন্ত প্রাচুর্যতা। যা কিনা আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য, সম্পদ এবং কোটি কোটি মুখের আমিষের যোগানে নির্ভরযোগ্য নির্ভরতা। হিসেবি জলজ আঁধারে আমরা ফলিয়ে চলেছি প্রয়োজনীয় উৎপাদন। আবার বিভিন্ন ক্যাটাগরির জলজ বৈশিষ্ট্যে মাছ উৎপাদনে আমাদের রয়েছে প্রযুক্তির সন্নিবেশ। মাছের ক্ষেত্রে আমাদের এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্রুড মাছ উৎপাদন। ডিম নিষিক্ত করা,ধানি তৈরি থেকে জুভ্যেনাইল তৈরি সর্ব শেষ মাছ উৎপাদন। সবই সম্পন্ন হয় সমকালিন প্রযুক্তির ব্যবহার মাধ্যমে। সরকার থেকে মন্ত্রণালয় উন্নয়নের সব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা আসে মৎস্য অধিদপ্তরে। আমাদের অধিদপ্তর প্রধান সৈয়দ আরিফ আজাদ এবং প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান সুনিপুন চিন্তা করে তৈরি করেন এক বাস্তবায়ন যোগ্য নির্দেশনা এবং পরিকল্পনার এক মাস্টার প্লান। চিন্তার পরিচয় কথায় না ভেবে কাজে প্রমাণের জন্য অধিপ্তরের সকলকে কাজে লাগিয়ে কাংঙ্খিত বা প্রত্যাশিত ফল আদায়ের সাবলিল চেষ্টা। প্রচেষ্টার সার্থকতা হিসেবে আমরা কার্প জাতীয় মাছকে চাষে এনে যেমন উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছি। আবার প্রাকৃতিক মাছকে টিকিয়ে রাখতে আমরা সক্ষম হয়েছি মহা বিপন্ন কয়েক প্রজাতির মাছকে। এক কথায় বলতে গেলে আমরা বলতে পারি যেখানেই জল, হোক তা মিষ্টি কিংবা লোনা সব জলাতেই আমরা উৎপাদন করতে পারি। এক সময়ের ইলিশ, যা হয়ে গিয়েছিল অন্যের। এখন আমরা গর্ব করতে পারি এখন ইলিশ শুধুই আমাদের। সিন্ধু থেকে ইরাবতি কিংবা গঙ্গা বাহিত হয়ে আবার এখন ইলিশ কেবলই আমাদের। মৎস্য অধিদপ্তর সময় বিবেচনায় ইলিশের আশ্রয় দিয়েছে। ইলিশের বাসস্থান, প্রজনন, জাটকা ইলিশের নির্ভয় বড় হতে দেয়ার নিশ্চয়তা আমরা দিয়েছি। ফারাক্কার কারণে ইলিশ মাছের জন্য আমাদের যে ক্ষতি এখন সে ক্ষতি কি শুধুই আমাদের। তা কিন্তু নয়। ভারতের গঙ্গায় ইলিশ হচ্ছেনা কেন। সে কারণও কিন্তু ঐ ফারাক্কার প্রভাব। আমাদের সরকার নদী, খাল, বিল খনন করে নব্যতা ধরে রাখতে চেষ্টা করে আসছেন। যেন বর্ষার জল ধরে রেখে আমরা মাছ উৎপাদন করতে পারি। জোয়ার এবং ভাটার প্রভাবে

আমাদের মোহনার বিশাল জল রাশিতে যে ঢেউ তৈরি হয় তাতে এখানে জলজ প্রাণির উৎপাদন প্রভাবকে আরো সক্রিয় করে তোলে। নদী থেকে নদী যুক্ত হয়ে আমাদের মোহনা যেন এক একটি জলজ সম্পদের সৃষ্টির অপূর্ব আশ্রয়স্থল।

এদেশে মাছ চাষে মৎস্য অধিদপ্তর চাষির দোড় গোড়ায় প্রথম থেকেই কাজ করে আসছে। অধিদপ্তরের সাথে চাষির সম্পর্কটা নতুন বললে ভুল হবে। রোগ,মৃত্যু, উৎপাদন এবং প্রজনন বিষয়টি নিয়ে

মৎস্য প্রযুক্তির সম্ভাবনা

মাঠ পর্যায়ে বিষয়ভিত্তিক পরামর্শ আনুষ্ঠানিক ভাবে দিয়ে আসছে মৎস্য অধিদপ্তর। এরপরে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট জাতীয় চাহিদার আলোকে নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে প্রজনন এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৫০টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে। যে প্রযুক্তি পরবর্তী সময়ে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে কাজ করে চাষি পর্যায় ছড়িয়ে দেয়। এই গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রায় ১৫ টি বিপন্ন মৎস্য প্রজাতির সফল কৃত্রিম প্রজনন এবং চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবিত করেছে। যে জন্য মুখ বাড়ার সাথে সাথে

আরো মাছ উৎপাদনের ফলে কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। এক দিকে গবেষণা অন্য দিকে এর ব্যবহারিক প্রয়োগ গতি সঞ্চার করে ৮০'র দশক থেকে। এই প্রযুক্তির প্রয়োগে ছোট মাছের চাষ, হাস-মুরগির সমন্বিত চাষ পদ্ধতি, নার্সারী ব্যবস্থাপনা, হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা, ধানের ক্ষেতে মাছের চাষ ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে। চিংড়ির উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনা, কাঁকড়ার ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে প্রযুক্তির ব্যবহারের সফলতা ছড়িয়ে পড়েছে মাঠ পর্যায়ে। আবার মৌসুমি পুকুরে রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ, পুকুরে তেলাপিয়ার চাষ, পাঙ্গাসের চাষ, রাজপুঁটির চাষ পদ্ধতি আমাদের মাছ উৎপাদনের ঘাটতি মোকাবেলায় নীরব উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানে চাষির প্রযুক্তি সরবরাহের এক উদ্ভাবন হিসেবে 'ফলাফল প্রদর্শন' ঠিক এক প্রযুক্তি উপস্থাপন হিসেবে এগিয়ে এসেছে। আবার বর্তমানে ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ, গলদা চিংড়ির ব্রুড উৎপাদনকে মাছের পোনা উৎপাদন, কাঁকড়া মোটাতাজা করা, কুঁচিয়ার পোনা উৎপাদন যেন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের এক আশির্বাদ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

আমরা দেখেছি দেশের প্রায় ১.৮২ কোটি মানুষ মাছ চাষের প্রতিটি পর্যায়ে কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। এর মধ্যে প্রায় ১৪ লাখ মহিলা সম্পৃক্ত থাকায় মাছ চাষ যেন কর্ম শক্তি ব্যবহারে এক শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে।

গৌতম কুমার রায়
গবেষক ও পরিবেশ ব্যক্তিত্ব।